

# আত্মপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)



রবীন্দ্রনাথ।। ১৯০৫

## সূচীপত্র

প্রকাশ বা রচনার কাল পৃষ্ঠা

১॥	১৩১১	৭
২॥	ফাল্গুন ১৩১৮	৩১
৩॥	আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪	৩৯
৪॥	বৈশাখ ১৩৩৮	৭৩
৫॥	পৌষ ১৩৩৮	৭৭
৬॥	বৈশাখ ১৩৪৭	৯৭
৭॥	ভাদ্র ১৩১৭	১০৭
সংযোজন		
সম্মান॥	বৈশাখ ১৩৩৪	১১৫
গ্রন্থপরিচয়		১২১

### গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটি ‘বঙ্গভাষার লেখক’ (১৩১১) গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের যে বিরোধ এক সময়ে বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এই প্রবন্ধ হইতেই এক রূপ তাহার সূচনা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ‘দম্ভ ও অহমিকা’র সম্মান পাইয়াছিলেন।<sup>[১]</sup> বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের অস্থানে, রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার এক অংশ, মূল প্রবন্ধের পরিপূরকরূপে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।

বহুদিন হইল জার্মান কবিশ্রেষ্ঠ গ্যায়টের কোনো রচনার ইংরেজি তর্জমাতে একটা কথা পড়িয়াছিলাম; যতদূর মনে পড়ে, তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়।

এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উলটা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।

তাই যদি হয় তবে এতবড়ো একটা অত্যন্ত সাধারণ কথাকে বিশেষ ভাবে বলিতে বসে কেন?

ইহার উত্তর এই যে, অত্যন্ত সাধারণ কথারও যখন জীবনের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উপলব্ধি হয় তখন তাহা আমাদের হঠাৎ একটা আলোকের মতো চমৎকৃত করিয়া দেয়। যাহা সাধারণ তাহাকেই বিশেষ করিয়া যখন জানিতে পাই তখন তাহার বিস্ময় বড়ো বেশি করিয়া আঘাত করে। মৃত্যুর মতো অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী নিশ্চিত ও পুরাতন পদার্থেরও বিশেষ পরিচয় আমাদের একটা সদ্যোদ্যত আবির্ভাবের মতো চমক লাগাইয়া দেয়। এইজন্য বিশেষ অবস্থায় সাধারণ কথাকেও বিশেষ করিয়া বলিবার আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইয়া থাকে। বস্তুত সাহিত্যের বারোআনা কথাই নিত্য জ্ঞাত কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মতো নূতন করিয়া বলা।

সম্প্রতি অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি গ্রন্থে পড়িতেছিলাম:

Though man is essentially self-conscious, he always *is* more than he *thinks* or *knows*; and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unaware, but which, nevertheless, affect everything he says or does. Of these ideas we may, therefore, expect to find some indication even in the earliest stage of his development; but we cannot expect that in that stage they will appear in their proper form or be known for what they really are.

যে আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদের বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়াই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে— আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো-এক রকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহা অলংকার নহে, কারণ, ইহা কাহারও একলার সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের জীবনবিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিত্য সাধারণ কথা ও জ্ঞাত কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারি না।

—রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য। বঙ্গদর্শন মাঘ ১৩১৪

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে ‘দেশের প্রতিভূস্বরূপ’ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতা টাউনহলে কবিসংবর্ধনা করেন। এই অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানস্বরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ মন্দিরে একটি আনন্দসম্মিলন (২০ মাঘ ১৩১৮) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সেখানে পঠিত হয়। প্রবন্ধটি ভারতী পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩১৮) ‘অভিভাষণ’ নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের কোনো একটি সমালোচনার<sup>[১]</sup> উত্তরে এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধটি লিখিত হয়। রচনাটি ‘আমার ধর্ম’ নামে সবুজ পত্রে (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে<sup>[২]</sup> রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতের অন্য যে একটি সমালোচনার উল্লেখ আছে, তাহা বিপিনচন্দ্র পাল -কর্তৃক লিখিত<sup>[৩]</sup>।

সম্প্রতি জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের কবিকর্তৃক সংশোধিত অনুলিপি এই গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইল। এই অভিভাষণ প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা টাউন-হলে যে রবীন্দ্রজয়ন্তী (১১ পৌষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয় সেই উৎসবে পাঠ করিবার জন্য এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। এবং ‘প্রতিভাষণ’ নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। রচনাটি দীর্ঘ বলিয়া তথায় পঠিত হইতে পারে নাই, ছাত্র-ছাত্রীগণ-কর্তৃক সেনেট হলে অনুষ্ঠিত (১৫ পৌষ ১৩৩৮) রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে এই প্রতিভাষণ করি পাঠ করেন।

‘আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে’ -প্রবেশ উপলক্ষে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) ‘জন্মদিনে’ নামে প্রকাশিত হয়।

১৩১৭ সালে ‘বেঙ্গলী’ পত্রের সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগী -কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন, প্রাসঙ্গিক বোধে তাহা গ্রন্থপরিশেষে মুদ্রিত হইল। চিঠিখানি প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৪৮) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চিঠিতে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগের কাল, ১৩০৭ সালে ১৩০৯ জানিতে হইবে।

এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’র প্রথম খণ্ডে অবতরণিকা’রূপে মুদ্রিত হইয়াছে; অন্য রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই— পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত হইয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

১৩৮৬

বর্তমান সংস্করণে কবি-কর্তৃক চন্দননগরে কথিত ভাষণ শ্রীহরিহর শেঠের ‘রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর’ (আশ্বিন ১৩৬৮) গ্রন্থ হইতে সংগ্রহিত হইল।

১৪০০

১. ↑ কাব্যের উপভোগ: বঙ্গদর্শন মাঘ ১৩১৪
  ২. ↑ ‘ধর্ম প্রচারে রবীন্দ্রনাথ’, প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা; পুনর্মুদ্রণ— নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৪। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ‘ধর্ম প্রচারে রবীন্দ্রনাথ’, প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা; এবং রবীন্দ্রনাথের ‘আমার ধর্ম’ প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লিখিত ‘রবীন্দ্রনাথের ধর্ম’, প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা।
  ৩. ↑ পৃ ৪০
  ৪. ↑ ‘রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত’, বিজয়া, ১৩২০
-

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়াগা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতে এ কথা বলিতেই হইবে, আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ, আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারও কোনো লাভ দেখি না।

সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন  
ওগো কৌতুকময়ী।  
আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবারে  
বলিতে দিতেছ কই  
অন্তরমাবে বসি অহরহ  
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,  
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ  
মিশায়ে আপন সুরে।  
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,  
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,  
সংগীতশ্রোতে কূল নাহি পাই—  
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য— এমনি তাহার সৌন্দর্য, এমনি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয় যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন। কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র সে কথা গোপনে থাকে— বর্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত; কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়া তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই— অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা-কোনো বিশেষ ভার অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, যে-সকল লেখা উপলক্ষ্যমাত্র— তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশির এক-একট। ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না। সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম বসি এক ধারে  
আপনার কথা আপন জনারে,  
শুনতেছিলাম ঘরের দুয়ারে  
ঘরের কাহিনী যত;  
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে  
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে  
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে  
গড়িলে মনের মতো।

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশি কিছু নহে— কিন্তু সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড়ো হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই যে সুরটা, সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে-একটা রঙ ফলিয়া উঠিল, সেই রঙ ও সে রঙের তুলি তো আমার হাতে ছিল না।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়  
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,  
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়  
নূতন রাগিনী ভরে।  
যে কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,  
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,  
জানি না এনেছি কাহার বারতা  
কারে শুনাবার তরে।

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন, ‘বলো বলো, তোমার কথাটাই বলো। ঐ কথাটার জন্যই সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।’ এই বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন; স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন এবং আমারই কথার ভিতর দিয়া কী-সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,  
কেহ এক বলে, কেহ বলে আর,  
আমারে শুধায় বৃথা বার বার—  
দেখে তুমি হাস বুঝি।

কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে  
আমি মরিতেছি খুঁজি।

শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে-একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কিনা জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে